

চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ : একটি দার্শনিক অনুসন্ধান

(The Sādhana-mārga of Chittavṛtti-Nirodha: A Philosophical Inquiry)

Prosanta Majhi

Research Scholar, Dept. of Philosophy
The University of Burdwan

Abstract :

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশ চর্চিত বিষয়। তাই ভারতীয় দর্শনকে বলা হয় ‘মোক্ষশাস্ত্র’। তবে মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ কি, মোক্ষ লাভের উপায় বা মার্গ কি – এ বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যোগ মতে, চিত্তের পঞ্চবৃত্তির জন্যই চিত্ত সর্বদা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়ায় চিত্ত স্থির থাকতে পারে না। চিত্ত স্থির থাকতে না পারায় তা যোগের উপযোগী হতে পারে না। তাই যোগের উপযোগী হতে গেলে চিত্তের স্থিরতা প্রয়োজন। আর চিত্তের স্থিরতার জন্য প্রয়োজন চিত্তের বৃত্তি সকলের নিরোধ। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধের মার্গ তথা সাধনপথ অনুসন্ধান করা। তাই এই প্রবন্ধের শিরোনাম করা হয়েছে – ‘চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ : একটি দার্শনিক অনুসন্ধান’। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে চিত্তের স্বরূপ, তারপর চিত্তবৃত্তির স্বরূপ ও তার প্রকারভেদ আলোচনা পূর্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ হিসেবে অভ্যাস, বৈরাগ্য ও অষ্টযোগাঙ্গ বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

KeyWord : যোগ, চিত্ত, চিত্তভূমি, ক্লেশ, চিত্তবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, অভ্যাস, বৈরাগ্য, অষ্টযোগাঙ্গ।

Discussion :

ভারতীয় আন্তিক দর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হল যোগ দর্শন। এই যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। মহর্ষি পতঞ্জলির ‘যোগসূত্র’ এই যোগ দর্শনের প্রথম ও মূলগ্রন্থ। মহর্ষি পতঞ্জলির এই ‘যোগসূত্র’ গ্রন্থটি চারটি পাদে বিভক্ত, যথা - সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। ‘যোগসূত্র’-এর উক্ত চারটি পাদের মধ্যে প্রথম পাদ অর্থাৎ সমাধিপাদের প্রথম সূত্র এ বলেছেন,

“অথ যোগানুশাসনম্”^১

অর্থাৎ যোগানুশাসনরূপ শাস্ত্রের বিষয় হল ‘যোগ’। এই ‘যোগ’ শব্দের সাধারণ অর্থ ‘যুক্ত হওয়া’। তবে পতঞ্জলি ‘যোগ’ শব্দটিকে এরূপ সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং যোগসূত্রে যোগ শব্দটিকে পতঞ্জলির বিশেষ অর্থে অর্থাৎ ‘সমাধি যোগ’ অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর এই যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে পতঞ্জলির সমাধিপাদের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন - “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”^২

অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকলের নিরোধই হল যোগ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, চিত্ত কী? চিত্তের বৃত্তিই বা কী?

চিত্তের স্বরূপ :

মহর্ষি পতঞ্জলি ও ভাষ্যকার ব্যাসদেব বিভিন্ন জায়গায় মন, অহংকার ও বুদ্ধি -এই তিনটি অন্তঃকরণকে বলেছেন চিত্ত। পাতঞ্জলির দর্শনে বলা হয়েছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি থেকে চিত্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং চিত্ত হল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। যোগ দর্শনে মনকে চিত্তের সমার্থক বলা হয়। অচেতন প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে চিত্তও অচেতন। কিন্তু চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত চেতন বলে প্রতিভাত হয়। তবে চিত্ত ত্রিগুণময়ী হলেও তাতে কাল বিশেষে সত্ত্ব গুণের আধিক্য থাকে। আর সত্ত্ব গুণের আধিক্যবশত চিত্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। যদিও চিত্তে সর্বদা সত্ত্ব গুণের আধিক্য থাকে না। বরং সত্ত্ব, রজঃ ও তম্ এই তিন গুণের আধিক্যের তারতম্য বশত চিত্ত নানারূপ ধারণ করে। আর চিত্তের এই বিভিন্ন অবস্থা বা স্তরকে বলা হয় চিত্তভূমি(Cittabhumi)। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, এই চিত্তভূমি হল পাঁচ প্রকার, যথা - i) দ্বিপ্ত, ii) মুঢ়, iii) বিদ্বপ্ত, iv)

একাগ্র এবং v) নিরুদ্ধ। এই পাঁচপ্রকার চিত্তভূমির মধ্য একাগ্র ভূমিতে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তি ছাড়া অন্য সব বৃত্তির নিরুদ্ধ হয়। আর এই একাগ্রভূমিতে বাহ্যবস্তুবিষয়ক প্রমাণাদিবৃত্তির যে নিরোধ হয়, তাই হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আর নিরুদ্ধ ভূমিতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও স্থির হওয়ায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীন হয়, তাই চিত্তের নিরুদ্ধভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

চিত্তবৃত্তির স্বরূপ ও বিভিন্ন প্রকার :

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, ‘চিত্ত’ হল ‘মন’ আর ‘বৃত্তি’ হল ‘পরিণাম’। সুতরাং ‘চিত্তবৃত্তি’ হল ‘চিত্তের বা মনের পরিণাম’। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হবার ফলে চিত্তের যে বিষয়াকার পরিণতি, তাই হল চিত্তের বৃত্তি। যোগসূত্রাকারের মতে, জীবের চিত্তের সঙ্গে যখন জাগতিক যে কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে তখন চিত্ত সেইরূপ আকার ধারণা করে। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্তিকে বলা হয় চিত্তবৃত্তি (Chittavṛtti)। চিত্তের এই বিকার বা বৃত্তির মাধ্যমে আত্মার বিষয়জ্ঞান হয়ে থাকে। তাঁর মনে, আত্মা বা পুরুষ স্বরূপত মুক্ত, শুদ্ধ এবং বিকারহীন। গতিশীল তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিফলিত হলে চন্দ্রকে যেমন গতিশীল মনে হয়, তেমনি আত্মা চিত্তে প্রতিফলিত হলে আত্মাকেও পরিণামী মনে হয়।

পতঞ্জলির মতে, পরিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধ সকলকেই বৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - (ক) ক্লিষ্ট ও (খ) অক্লিষ্ট। যে চিত্তবৃত্তি ক্লেশদায়ক তাকে বলা হয় ক্লিষ্ট। যে চিত্তবৃত্তি ক্লেশনাশক সেই চিত্তবৃত্তিকে বলা হয় অক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা, বৈরাগ্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশ নাশক হওয়ায় এগুলি অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি। অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিতে ক্লেশের নাশ হলেও বৃত্তির নাশ হয় না। আর ক্লিষ্ট/ক্লেশ হল পাঁচ প্রকার। যথা - i) অবিদ্যা(Ignorance), ii) অস্মিতা(Egotism), iii) রাগ(Desire), iv) দ্বেষ(Aversion) ও v) অভিনিবেশ (Tenacity of life)। এই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল হল পাঁচ প্রকার। এই প্রসঙ্গে পতঞ্জলি তার যোগসূত্রে সমাধি পাদের ৫ নং সূত্রে বলেছেন,

“বৃত্তয়ঃ পঞ্চতথ্যঃ ক্লিষ্টাহক্লিষ্টাঃ”^৩

মহর্ষি পতঞ্জলি এই পঞ্চ প্রকার চিত্তবৃত্তি প্রসঙ্গে সমাধিপাদের ৬ নং সূত্রে বলেছেন “প্রমাণবিপর্যয় বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ” অর্থাৎ পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি হল ১) প্রমাণ, ২) বিপর্যয়, ৩) বিকল্প, ৪) নিদ্রা ও ৫) স্মৃতি। উক্ত পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল নিম্নরূপ -

প্রমাণ : যোগসূত্রাকার মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিপাদের ৭ নং সূত্রে প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- “প্রত্যক্ষানুমান আগমাঃ প্রমাণানি” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটিকে বলা হয় প্রমাণ।

বিপর্যয় : যোগসূত্রাকার তার যোগসূত্রে সমাধিপাদে ৮ নং সূত্রে বলেছেন “বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্” অর্থাৎ বিপর্যয় হল অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান। এককথায় বলা যায়, যে কোন প্রকার ভ্রান্ত জ্ঞানই হল বিপর্যয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলকে বিপর্যয় বলা হলেও কেবল পরমার্থ সম্বন্ধে পরিভাষিত জ্ঞান হল বিপর্যয় জ্ঞান। যে কোন ভ্রান্ত জ্ঞানকে বিপর্যয়বৃত্তি বলা যায়, যোগীরা যে সমস্ত বিপর্যয়কে দুঃখের মূল স্থির করে নিরোধ বলেই গ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয় ক্লেশরূপ বিপর্যয়।

বিকল্প : পতঞ্জলি তাঁর সূত্রগ্রন্থে সমাধিপাদে ৯ নং সূত্রে বলেছেন – “শব্দজ্ঞানানুপাতী শব্দশূন্যো বিকল্পা” অর্থাৎ যে জ্ঞান শব্দজনিত জ্ঞানের সাথে সাথে হয়; আর বাস্তবে যে বিষয়টি নেই সেই জ্ঞানকে বলা হয় বিকল্প। এই প্রসঙ্গে বলা হয়,

“Vikalpa is a notion devoid of a thing in reality corresponding thereto, following upon knowledge produced by words.”^৪

অন্যভাবে বলা যায়, যে জ্ঞান কেবল শব্দাশ্রয়ী, যেখানে শব্দের অর্থ অনুসারে কোন বস্তু থাকে না, চিত্তের সেই বৃত্তি বা জ্ঞানকে ‘বিকল্প’ বলা হয়। যেমন : আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ বলে বস্তু বাস্তবে কিছু নেই। কিন্তু এরূপ পদ বাস্তবে না থাকলেও ঐসব শব্দের প্রচলন আছে এবং ঐ সব শব্দ শুনে শ্রোতার চিত্তে একপ্রকার বৃত্তির উৎপত্তি হয়।

এই বিকল্প তিন প্রকার, যথাঃ বস্তু-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। যে সকল স্থলে বস্তু দুয়ের একতা থাকলেও ব্যবহারিকের জন্য তাদের ভেদবচন বৈকল্পিক সেই শব্দকে বলা হয় বস্তু বিকল্প। যেমন ‘রাহুর শির’। ব্যবহার সিদ্ধির জীবনে অকর্তার ন্যায় কর্তার ব্যবহার হয়, তাকে

বলে ক্রিয়া-বিকল্প। যেমন বাণিত্তিচিহ্ন শব্দ। আর যে সব পদ অভাবার্থ, সেইরূপ চিত্তবৃত্তিকে বলা হয় অভাব-বিকল্প। যেমনঃ ‘পুরুষ উৎপত্তিধর্মশূন্য’। বাক্যগুলি ভাষার দ্বারা চিন্তা করার জন্য বিকল্পবৃত্তির সহায়তা প্রয়োজন।

নিদ্রা : মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর ‘যোগসূত্রে’ পঞ্চ চিত্তবৃত্তির মধ্যে চতুর্থ চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ নিদ্রার লক্ষণ দিতে গিয়ে সামাধিপাদের ১০ নং সূত্রে বলেছেন, “অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তিঃ নিদ্রাঃ” অর্থাৎ অভাবের জ্ঞানকে গ্রহণ করে যে বৃত্তি সেই বৃত্তিকে বলা হয় নিদ্রাবৃত্তি। এখানে অভাব বলতে বোঝানো হয়েছে জাগ্রত বা স্বপ্নের অভাব। আর এই জাগ্রত ও স্বপ্নের অভাবে তমোমূলক যে চিত্তবৃত্তি তাকেই বলা হয় নিদ্রা। ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মতে, নিদ্রা হল চিত্তের বৃত্তি বিশেষ। তাই মানুষ গাঢ় ঘুম থেকে উঠে, বলে ‘আজ আমার এত ভালো ঘুম হয়েছে যে, কোন হুঁশ ছিল না।’ এইরূপ স্মৃতি বৃত্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে নিদ্রা হল একটি চিত্তবৃত্তি তা না হলে ‘নিদ্রাকালে আমার হুঁশ ছিল না’ একথা জেগে বা জাগ্রত অবস্থায় বলা যেত না বা জ্ঞাত হতো না। আর যেহেতু মানুষ নিদ্রা অবস্থায় যে পরিস্থিতি সেটা জাগ্রত অবস্থায় বলতে পারে বা জ্ঞাত হয় যে ‘নিদ্রা অবস্থায় আমার কোন হুঁশ ছিল না’ সেহেতু বলাই বাহুল্য যে, “নিদ্রা হল চিত্তের বৃত্তি বিশেষ।” এই নিদ্রা চিত্তবৃত্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যে নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে সাধকের মন-ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিকভাবে ভরে ওঠে, বিন্দুমাত্র অলস থাকে না, আর যোগ সাধনার পক্ষে উপযোগী বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই নিদ্রাকে বলা হয় অক্লিষ্ট নিদ্রা। অপরদিকে, যে নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে সাধকের মন বিশ্রামজনিত সুখের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করে, সেই নিদ্রাকে বলা হয় ক্লিষ্ট নিদ্রা।

স্মৃতি : যোগসূত্রকার তাঁর সূত্রগ্রন্থে প্রথমপাদ অর্থাৎ সমাধিপাদে ১১ নং সূত্রে স্মৃতি চিত্তবৃত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, “অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ” অর্থাৎ অনুভূত বিষয়টি গোপন না থাকা অর্থাৎ প্রকাশিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় স্মৃতি। অন্যভাবে বলা যায়, অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ের অনুরূপ আকারযুক্ত যে বৃত্তি তাকে বলা হয় স্মৃতি চিত্তবৃত্তি। উপরিউক্ত চার প্রকারের বৃত্তি ব্যতীত এই স্মৃতিবৃত্তির দ্বারাও যে সংস্কার চিন্তে উৎকীর্ণ হয়, তার থেকে পুনরায় স্মৃতিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই স্মৃতিবৃত্তিও ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। যার স্মরণে মানুষের মধ্যে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যোগ সাধনে শ্রদ্ধা উৎসাহ বর্ধিত হয়, আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা হয় তা হল অক্লিষ্ট। আর, যার দ্বারা ভোগের প্রতি রাগ-দ্বेष বর্ধিত হয় তা হল ক্লিষ্ট। স্বপ্নকে অনেকে স্মৃতিবৃত্তি বলে মনে করেন কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে জাগ্রত অবস্থার মতো সমস্ত বৃত্তিগুলির আবির্ভাব হতে দেখা যায়। অতএব কোনো একটি বৃত্তিতে তার অন্তর্ভাব মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে হয় না।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ অনুসন্ধান :

পঞ্চবিধ চিত্তভূমিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ -এই ত্রিগুণের তারতম্য হেতু চিত্ত সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয় আকার ধারণ করে। ফলে যোগের প্রয়োজনীয় স্থায়ী ভাবে চিত্তের যে স্থিরতা তা চিন্তে থাকে না। আর চিন্তে স্থিরতা না থাকায় চিত্ত যোগের উপযোগী হতে পারে না ফলে কৈবল্য লাভও সম্ভব হতে পারে না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলেছেন। আর এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হল চিত্তের বিষয়াসক্তির আত্যন্তিক নিবৃত্তি। মহর্ষি পতঞ্জলি এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় হিসেবে বলেছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রধান উপায় হল দুটি, যথা - অভ্যাস ও বৈরাগ্য এবং সাক্ষাৎ উপায় হল আটটি – যাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ হিসেবে অভ্যাসের ভূমিকা :

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর ‘যোগসূত্রে’ অভ্যাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে ১৩ নং সূত্রে বলেছেন,

“তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ”^৩

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মধ্যে স্থিতি বিষয়ক যত্নের নাম হল অভ্যাস। সূত্রকার কর্তৃক অভ্যাসের উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকার বলেছেন, “চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রাসত্ত্ববাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীৰ্যম্ উৎসাহ তৎসম্পাদরিষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ॥” অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ নিরোধের যে প্রবাহ তার নাম হল স্থিতি। আর সেই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ন বা বীৰ্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই স্থিতির সম্পাদনোচ্ছায় তার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তার নাম হল অভ্যাস। আর এই অভ্যাস দীর্ঘকালসেবিত, নিরন্তরসেবিত ও সংস্কারযুক্ত অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য বিদ্যা ও শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদিত হলে তাকে বলা যায় সংকার্যবান এবং সেই অভ্যাস হয় দৃঢ়ভূমি। আবার এই অভ্যাসের দ্বারা একাগ্রতাশক্তি বাড়ে এবং বিঘ্ন নাশ হয়। ফলে সুখী মানুষের মিত্রতাভাব, দুঃখী মানুষের দয়ার ভাব, পুণ্যাত্মা পুরুষের

প্রসন্নতাভাব ও পাপীগণে উপেক্ষার ভাব রাখলে চিত্তের রাগ-দ্বेष, ঘৃণা-দীর্ঘা-ক্রোধ ইত্যাদি মলের নাশ হয় এবং শুদ্ধ ও নির্মল চিত্তের প্রকাশ ঘটে। সেজন্য সাধকের অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া প্রাণবায়ুকে শরীর থেকে বার বার পরিত্যাগ ও যথাশক্তি বাইরেই রুদ্ধ করে রাখার অভ্যাসের দ্বারাও চিত্ত নির্মল হয়। আর এইভাবে অভ্যাস করতে করতে সাধকের নানা প্রকার দিব্য বিষয়ের সাক্ষাৎ হয়। আর ওই সব দিব্য বিষয়ের অনুভবকারী বৃত্তিকে বলা হয় বিষয়বতী প্রবৃত্তি। এরূপ প্রবৃত্তির উদয়ে সাধকের যোগমার্গে বিশ্বাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তা আত্মচিন্তনের অভ্যাসে মনকে স্থির করার একটা হেতু বা উপায় হয়ে যায়। অভ্যাসের দ্বারা মনকে স্থির করার অপর একটি উপায় হল, অভ্যাসের দ্বারা সাধক যদি সুখরোহিত জ্যোতিরময় প্রবৃত্তির অনুভব হয়, তাহলে তাও মনের স্থিরতা আনে। আবার যে পুরুষের রাগ-দ্বেষ সবধা নষ্ট হয়ে গেছে সেরকম আসক্তিহীন পুরুষকে ধ্যেয় করে নিয়ে যে ধ্যান করে অর্থাৎ তাদের বৈরাগ্যাক্ত ভাবকে যে মনন করে তার চিত্তও স্থির হয়ে যায়। এছাড়াও চিত্তের স্থিরতার অপর একটি উপায় নির্দেশ করে যোগসূত্রে সমাধিপাদে ৩৮ নং সূত্রে বলা হয়েছে – “স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা” অর্থাৎ স্বপ্নে যদি কোন অলৌকিক দর্শন বা অনুভব হয়ে থাকে, যেমন দেবমূর্তি বা ইষ্টমূর্তির দর্শন, তাহলে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির স্বরণ-চিন্তন করলেও মন স্থির হয়ে যায়। আর এইভাবে ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তখন সাধক আপন চিত্তকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, বৃহৎ হতে বৃহত্তর মহান পদার্থ পর্যন্ত, যখন ইচ্ছা সেখানে ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ স্থির করতে সমর্থ হয়। আপন চিত্তের উপর তার পূর্ণ অধিকার জন্মায়। এটি চিত্তের স্থিরতা প্রাপ্তির যোগ্যতার নিদর্শন বটে।

পূর্বোক্ত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন স্বচ্ছ স্ফটিক মণির মতো অতীব নির্মল হয়ে যায়, যখন তার বাহ্য বৃত্তিসকল নিশ্চল হয়ে যায়, থাকে শুধু ধ্যেয় সেই সময় সাধক ইন্দ্রিয়ের স্কুল কিংবা সূক্ষ্ম বিষয়াদি অথবা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধি পুরুষ এর যে কোনো একটি ধ্যেয়তে আপন চিত্তকে যখন স্থাপন করেন তখন সেখানেই স্থিতিলাভ করেন এবং চিত্ত সেই ধ্যেয় বস্তুতে স্থিতিলাভ করে তদাকার হয়ে যায়। একে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে সাধক ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, যে বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় অথবা ভ্রমের অবকাশ থাকে না। এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল চার প্রকার, যথা - সবিবর্তক সমাধি, নির্বিবর্তক সমাধি, সবিচার সমাধি ও নির্বিচার সমাধি। এই চার প্রকার সমাধির মধ্যে নির্বিচার সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যোগীর চিত্তের স্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিপক্বতা লাভ করে এবং তার সমাধি স্থিতিতেও কোনো প্রকারের কিঞ্চিৎমাত্র মলিনতা থাকে না। এই অবস্থায় যোগী অত্যন্ত নির্মল ও স্বচ্ছ বুদ্ধির অধিকারী হন। এই অবস্থায় যোগীর বুদ্ধি ঋতন্তরা হয় অর্থাৎ স্বরূপকে গ্রহণ করে, সেখানে সংশয় ও ভ্রমের লেশমাত্র থাকে না। এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞার দ্বারা বস্তুর স্বরূপের যথার্থ ও পূর্ণ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহিত) জ্ঞান লাভ হয়। এই বুদ্ধি উদিত হলে যখন মানুষের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় তখন তার প্রকৃতি ও তার কার্যে স্বভাবতই বৈরাগ্য আসে। ওই বৈরাগ্যের সংস্কার পূর্বের জন্মে থাকা সমস্ত রাগ-দ্বেষময় সংস্কারকে ভঙ্গ করে দেয়। এর ফলে যোগী শীঘ্রই মুক্তাবস্থায় পৌঁছে যায়। আর যখন ঋতন্তরা প্রজ্ঞা-জনিত সংস্কারের প্রভাবে সমস্ত রকম সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়, তখন ঋতন্তরা প্রজ্ঞার দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারের প্রতিও আসক্তি না থাকায় তারও নিরোধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সংস্কারের বীজটি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ হয়ে যায়। এটি হল নির্জীব সমাধি, যাকে কৈবল্য অবস্থাও বলা হয়।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ হিসেবে বৈরাগ্যের ভূমিকা :

চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রধান দুটি উপায়ের মধ্যে অপর একটি হল বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তির প্রবাহ পরম্পরাগত সংস্কার অনুযায়ী সাংসারিক ভোগের প্রতি ধাবিত হওয়ার প্রবাহকে রুদ্ধ করার উপায় হল বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা এই লোকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভবযোগ্য যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর সমাহারকে এখানে ‘দৃষ্ট’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার যা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ নয়, এরূপ ভোগ উপভোগ যারা করেছেন তাদের দ্বারা শ্রুত ভোগ্য বিষয়ের সমাহারকে বেদে ও শাস্ত্রে ‘আনুশ্রবিক’ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। উপরিউক্ত দুই প্রকারের ভোগ হতে চিত্ত যখন সম্পূর্ণভাবে তুষণরহিত চিত্তের যে ‘বশীকার’ নামক অবস্থাবিশেষ তা হল ‘বৈরাগ্য’। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

“বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যমা”^৬

তবে এই বশীকাররূপ চিত্তাবস্থা একেবারেই সিদ্ধ হয় না। তার পূর্বে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে, যথা - ১) যতমান, ২) ব্যতিরেক, ৩) একেন্দ্রিয়, এই তিনটি অবস্থার ৪) বশীকার সিদ্ধ হয়। ‘বিষয়ে-ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করব না’ এই চেষ্টা করতে থাকা যতমান-বৈরাগ্য। সেটা কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হলে যখন কোন কোন বিষয় থেকে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্রীয়মান হতে থাকে তখন ব্যতিরেকপূর্বক বা পৃথক করে কখন কখন বৈরাগ্যবস্থা অবধারণ করবার সামর্থ্য জন্মালে তাকে ব্যতিরেক-বৈরাগ্য বলে। সেটা আয়ত্ত হলে যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় থেকে সম্যক্ নিবৃত্তি হয় অভ্যাসের দ্বারা। কিন্তু কেবল রাগ ও ঐশ্বর্যরূপে মনে থাকে, তখন তাকে একেন্দ্রিয় বলা হয়। একেন্দ্রিয় অর্থে

যেটা কেবল মনোরূপ এক ইন্দ্রিয় থাকে। পরে বশী যোগীর যখন ইচ্ছাপূর্বক ও রাগকে নিবৃত্তি করতে হয় না, যখন স্বভাবত চিত্ত ও বং ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাকে অপর বৈরাগ্যের পূর্ণতারূপ হেয়োপাদেয় বা ত্যাগ-গ্রহণ শূন্য বশীকার-বৈরাগ্য বলে। আর এটাই বিষয়ের পরম উদ্দেশ্য। আর চিত্তের এই বশীকার সংজ্ঞারূপ বৈরাগ্য দ্বারা সাধকের চিত্তের বিষয়-বাসনার অভাব ঘটে এবং আপন ধ্যেয়-র প্রতি একাগ্রচিত্ততা আসে। যখন সাধকের এরূপ পরিপক্ক সমাধি অবস্থা লাভ হয় তখন পুরুষ বিষয়ক বিবেক-জ্ঞান প্রকট হয় সেই অবস্থায় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণ ও তাদের কার্যসকল সাধককে বিন্দুমাত্র প্রলোভিত করতে পারে না এবং তখন সাধক সম্পূর্ণরূপে আত্মকাম অর্থাৎ নিজাম হয়ে যায় সেই রাগ রহিত অবস্থাকে পর-বৈরাগ্য বলা হয়। আর সাধকের যখন পর-বৈরাগ্যের প্রাপ্তি হয় তখন স্বভাবতই চিত্ত সাংসারিক পদার্থের দিকে ধাবিত হয় না বরং চিত্ত সেখানে আপনা-আপনিই উঠে যায়। ওই উপরত অবস্থায় প্রতীতির নাম বিরাম-প্রত্যয়। এই উপরতি (সংসার বিরক্তি) প্রতীতির অভ্যাসক্রমও যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন চিত্তে আর কোনো প্রকার বৃত্তি থাকে না। কেবল অন্তিম-উপরত অবস্থার সংস্কারের সাথে চিত্ত থাকে। ক্রমে নিরোধ সংস্কারের ক্রমের সমাপ্তিতে সেই চিত্ত আপন কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং দ্রষ্টার আপন স্বরূপে স্থিতি হয়। একেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি, নির্জীব সমাধি বা কৈবল্য অবস্থা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। পরিশেষে উল্লেখ্য, যে পুরুষের সাধন (অভ্যাস ও বৈরাগ্য) তীব্র গতিতে চলে, যিনি সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে তৎপরতাসহ আপন সাধনে রত থাকেন, তিনি যোগে শীঘ্র কৃতকার্য হন।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপথ হিসেবে অষ্টাঙ্গযোগের ভূমিকা :

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর ‘যোগসূত্রে’ সমাধিপাদে বলেছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রধান দুটি উপায় হল অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বিবেক-জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয় অভ্যাসের দ্বারা এবং বিষয়ে বৈরাগ্য আসে বৈরাগ্যের দ্বারা। তাঁর মতে, এই দুটি উপায় ছাড়াও যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনপাদে কিছু সাক্ষাৎ উপায়ের কথা উল্লেখ বলা হয়েছে। আর এখানে সাক্ষাৎ উপায় হিসেবে আটটি যোগাঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। এই আটটি যোগাঙ্গ একসঙ্গে বলেছেন অষ্টাঙ্গযোগ। এই প্রসঙ্গে যোগসূত্রাকার তার যোগসূত্রে দ্বিতীয় পাদ তথা সাধনপাদে ২৯ নং সূত্রে বলেছেন “যমনিয়ামাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান সমাধয়োদৃষ্টাবস্থানি” অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি -এই আটটি হল যোগের অঙ্গ। এই আটটি যোগের অঙ্গকে বলা হয় অষ্টযোগাঙ্গ। যোগের এই অষ্টাঙ্গের দ্বারা চিত্তের মালিনতা নষ্ট হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর জ্ঞানের দীপ্তির চরম সীমাই হল বিবেকখ্যাতি। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বিভূতিপাদের ৪ নং সূত্রে বলেছেন অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে শেষ তিনটি যোগ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি যোগ কোন এক ধ্যেয়র প্রতি প্রয়োগ করার নাম হল ‘সংযম’। আর সাধক নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা সংযমে বিজয় লাভ করার ফলে সে যে বিষয়ে সংযমী হতে চায় সেই সময়ই তা সিদ্ধ করতে পারে এই সময় সাধকের বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়। একেই আধ্যাত্মপ্রসাদ ও ঋতন্তরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত :

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, অষ্টযোগাঙ্গগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধির হানিকর ক্লেশ সমূহ বিনষ্ট হয়, ফলে চিত্তের অশুদ্ধি ও মালিন্য দূর হয় এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হতে হতে ক্রমশ বিবেকখ্যাতির উদয় হয়। আর সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার ক্লেশবীজ ও বৃত্তিসংস্কার ধ্বংস হলে পুরুষের চরম বৈরাগ্য লাভ হয়।

কিন্তু সমানতত্ত্ব সাংখ্য দর্শনে মহর্ষি কপিলের দুঃখ ত্রিবিধ, যথা - আধ্যাত্মিক দুঃখ (শারীরিক ও মানসিক দুঃখ); আধিভৌতিক দুঃখ (বাহ্যকারকের দ্বারা নিষ্পন্ন দুঃখ); আধিদৈবিক দুঃখ (বিদ্যাত্মিক, অঙ্গরা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন দুঃখ)। সাংখ্যমতে, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্মান্তিক নিবৃত্তি হল কৈবল্য বা মুক্তি। বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ-ভেদ জ্ঞান (‘সত্ত্ব পুরুষান্যতা প্রত্যয়’) দুঃখের ঐকান্তিক আত্মান্তিক নিবৃত্তির উপায়। “ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ” অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রকৃতি থেকে উদ্ধৃত তত্ত্ব, অব্যক্ত বা প্রকৃতি, জ্ঞ বা পুরুষ -এই তিনটির পৃথক পৃথক জ্ঞান হলে প্রকৃতি পুরুষ-ভেদ জ্ঞান হয়। সাংখ্যমতে, কৈবল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎকার স্বরূপ হওয়া চাই। প্রথমে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি থেকে ব্যক্ত-অব্যক্ত পুরুষকে পৃথক পৃথকরূপে শ্রবণ করতে হবে। তারপর এই শব্দবোধের বিষয়কে যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থিত করতে হবে। তারপর দীর্ঘকাল নিষ্ঠা ও সমাদরের সঙ্গে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করতে হবে। তার ফলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান প্রত্যয়রূপ সাক্ষাৎকারাত্মক বিবেকখ্যাতি বা বিবেকজ্ঞান হবে। এর ফলে আত্মার কৈবল্য বা মুক্তি লাভ হবে। শরীর থাকাকালীন এই মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই একে ‘জীবমুক্তি’ বলা হয়। এই অবস্থায় ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্মান্তিক নিবৃত্তি হয়। তারপর

প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয়ে দেহের বিনাশ হবে পূর্ণমুক্তি হবে- অর্থাৎ ঐ বিবেকবান পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর সম্বন্ধ হবে না। একে ‘বিদেহমুক্তি’ বলা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে মহর্ষি পতঞ্জলির মতকেই আমার যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ একথা ঠিক যে সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় হল ‘ত্রিবিধ দুঃখের আত্মান্তিক নিবৃত্তি’ ও ‘প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান’। কিন্তু আমার মতে, কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় হিসাবে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান নয়, বরং পতঞ্জলির স্বীকৃত অভ্যাস, বৈরাগ্য, যমাদি অষ্টাঙ্গযোগ ও ঈশ্বর প্রশ্রিয়ান ও কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, পৃ- ১।
২. শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, পৃ- ১।
৩. শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, পৃ- ১।
৪. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu, *An Introduction to the Yoga Philosophy*, p. 8.
৫. শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, পৃ- ৩।
৬. শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য, পাতঞ্জল যোগদর্শন, পৃ- ৩।

গ্রন্থপঞ্জী :

- আরণ্য, শ্রীমদ হরিহরানন্দ এবং অরণ্য শ্রীমদ ধর্মমেঘ ও ঘোষ বাহাদুর রায় যজ্ঞেশ্বর. *পাতঞ্জল যোগদর্শন*. কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ২০১৫.
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি. *সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ* (প্রথমখণ্ড). কলিকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৭২.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা. *সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮৪.
- বাগচী, দীপক কুমার. *ভারতীয় দর্শন*. কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮.
- Vasu, Rai Bahadur Srisa Chandra. *An Introduction to the Yoga Philosophy*. India: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited, 2004.
- বেদান্তচন্দ্র, শ্রী পূর্ণচন্দ্র. *পাতঞ্জল দর্শন*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ২০১৫.
- ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, শ্রী দীনেশচন্দ্র. *যোগ (যোগদর্শন)*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ২০০৬.
- ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, শ্রী দীনেশচন্দ্র. *ষড়দর্শন : যোগ*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮৪.
- মণ্ডল, প্রদ্যুৎ কুমার. *ভারতীয় দর্শন*. কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮.
- শঙ্করাচার্য, শ্রীমৎ পরমহংস. *পাতঞ্জল যোগদর্শন*. কলিকাতা: বীডন স্কোয়ার, ১২৯৭.